জিপিএ-পাঁচ, এডুকেশন ডিভাইড এবং আসামের দৃষ্টান্ত

গত ২৬শে সেপ্টেম্বর ০৫ বাংলাদেশের এইচএসসি পরীক্ষা ২০০৫-এর ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এবার অনেকেই খুশী। কারণ বিগত বছরের তুলনায় এবার আরো দ্বিগুণ সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী জিপিএ পাঁচ পেয়েছে। পাশের হার বিগত চার বছরে বেড়েছে দ্বিগুণেরও বেশী। কিন্তু এই ফলাফল প্রকাশিত হবার ফলে আরো কিছু নির্মম সত্য প্রকাশিত হয়ে পড়েছে।

প্রথমত যতোই ভালো ফলাফল হোক না কেন, পাশের হার যাই উর্ধ্বগতির হোক বা জিপিএ-পাঁচের সংখ্যা যতোই বাড়ুক; এইসব ফলাফলের সীমানা মাত্র ঢাকাসহ গুটি কয়েক হাতে গোণা শহর এবং সেইসব শহরের আরো হাতে গোণা কয়েকটি স্কুল-কলেজের মাঝেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। এইসব ফলাফলে ক্রমশই এটি পরিষ্কার হচ্ছে যে, শহরের গোটাকয়েক স্কুল ব্যতীত অন্যান্য স্কুলে শিক্ষা বলতে কোন কিছু নেই। ঐসব স্কুল-কলেজের শিক্ষকরা যথারীতি জনগণের করের টাকায় প্রায় পুরো বেতন পান। এইসব প্রতিষ্ঠানের জন্য সরকারী অর্থে দালান-কোঠাসহ অন্যান্য অবকাঠামো তৈরী করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে শিক্ষা নামক শব্দটি সেইসব প্রতিষ্ঠান থেকে উধাও হয়ে গেছে। দেশের প্রাথমিক স্কুল থেকে কলেজ পর্যন্ত এই সাধারণ চিত্রটি ভালোর দিকে যাবার পরিবর্তে দিনে দিনে আরো খারাপ হচ্ছে। খালেদা-নিজামী সরকার ২০০১ সালে ক্ষমতায় আসার পর নকল প্রতিরোধে বেশ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তখন পাশের হার কমতে থাকে। কিন্তু নির্বাচন ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে এখন তারা আবার পাশের হার বাড়ানোর দিকে নজর দিয়েছে। আমরা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে একথা বলতে পারি যে, পাশের হার বা জিপিএ পাঁচ-এর হার বাড়লেও শিক্ষার মান কিন্তু বিগত চার বছরে বাড়ার বদলে অনেক কমেছে। এই সরকারই কিছুদিন আগে পর্যন্ত আবার তথাকথিত একমুখী শিক্ষা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলো। ২০০৬ সাল থেকে তারা একমুখী শিক্ষাব্যবস্থার নামে এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির দিকে শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো। তারা বলছিলো যে, বহুমুখী শিক্ষাব্যবস্থার ফলেই নাকি শিক্ষার মান খারাপ হচ্ছিলো। কিন্তু তারা এটি বুঝতে পারছিলোনা যে, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি একমুখী বা বহুমুখী শিক্ষার নয়। এতে গোড়ায় গলদ রয়ে গেছে। শিক্ষার সিলেবাস, বই, শিক্ষক এবং ম্যানেজমেন্ট এই চারের রাহুগ্রাসে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার পচন ধরেছে। একে বহুমুখী থেকে একমুখী বা একমুখী থেকে

বহুমুখী করলেই তার উন্নতি হবে- এটি কোনমতেই সম্ভব নয়। অবশ্য দেশের মানুষের আন্দোলনের মুখে তারা সেটি শেষ পর্যন্ত স্থগিত করেছে।
প্রাথমিক থেকে কলেজ পর্যন্ত শিক্ষকদের নিয়োগের ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও দলীয়করণের ফলে সেইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক হিসেবে যারা যোগ দেন, তাদের অনেকেরই শিক্ষকতো দূরের কথা পিয়ন বা কেরানী হবার যোগ্যতাও থাকেনা। নকল করে, বন্দুক দেখিয়ে বা অন্য কোন উপায়ে একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর সার্টিফিকেট নিয়ে শিক্ষকতা নামক একটি মহৎ পেশায় যোগ দিয়ে এদের অনেকেই বিশেষত সরকারী দলের এমপি-নেতাদের চাটুকার, সমর্থক বা নেতায় পরিণত হয়। এইসব স্কুল কলেজের অনেকগুলো আছে যেগুলো খালেদা-নিজামী জোট সরকারের নেতাদের পারিবারিক-ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। এসবের অনেকগুলো এদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। আমি একটি কলেজকে চিনি, যার গভির্নং বডির সভাপতি, অধ্যক্ষ, বিভিন্ন বিভাগের কয়েকজন প্রফেসর ও প্রভাষক, গ্রন্থাগারিক, কেরানী, পিয়ন, দারোয়ান সবই সরকারী দলের উপজেলা আহ্বায়ক ও ঐ কলেজের অধ্যক্ষের পরিবারের সদস্য। ওরা কাজ করুক আর না করুক বেতন পায়। ঐ কলেজের অধ্যক্ষ বিগত বারো বছর যাবত ভূয়া শিক্ষকের নামে বেতন তুলে আত্মসাৎ করেছে-দুর্নীতি দমনে মামলা হয়েছে। কিন্তু তারপরেও তিনি কেবল যে কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে রয়ে গেছেন তাই নয় বরং তাকে সম্প্রতি বিএনপির উপজেলা কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে। ওখানে ভালো মানুষ কাউকে শিক্ষক বা গভির্নং বডিতে থাকতে দেয়া হয়না। ঐ পরিবারের বা খালেদা-নিজামীর দলের লোক না হলে ঐ কলেজে চাকুরী পাওয়া যায়না। ঐ একটি পরিবার কলেজের আয়-সম্পদ এমনকি কলেজপ্রাঙ্গনের ফলমূল-শাকসব্জি; সবই ভোগ করে। তারা তারপরেও কলেজের আয়-ব্যয়ের কোন হিসাব কাউকে দেয়না। সরকারের কেউ সেই হিসাব চায়না। সরকারের বাইরের কেউ হিসাব চাইলে হয় তার চাকুরী যায়, না হয় গভির্ণং বডি থেকে বিদায় নিতে হয়। আবার সরকারী দলের বা অধক্ষ্যের পরিবারের না হলেই কিংবা তাদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করলেই শিক্ষকদেরকে বাধ্য করা হয় চাকুরী ছাড়তে। এমনি একজন চাকুরীচ্যুত শিক্ষককে বিগত চার বছর ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামে পালিয়ে থাকতে হচ্ছে। তার ভিটেমাটি সহায় সম্পদ দখল করে তার স্কুল শিক্ষিকা স্ত্রীর গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারার চেষ্টাও করা হয়েছে। ক্ষমতাসীন দলের এক মহা প্রতিপত্তিশালী প্রতিমন্ত্রীর ছত্রছায়ায় এই প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার মান এতোটাই নেমেছে যে ওটি এখন গরু চড়ানোর স্থানে পরিণত হয়েছে। সরকার ঐ প্রতিষ্ঠানে মাসে কয়েক লক্ষাধিক টাকার বেতন দেয়। কিন্তু যতো জন শিক্ষক আছে ঐ কলেজে বছরে ততোজন ছাত্র-

ছাত্রী এইচএসসি বা ডিগ্রীতে ক্লাসই করেনা। লেখাপড়া বলতে কিছু নেই ওখানে। পাসের হার প্রায় শুণ্যের কোঠায়। এখন এমনকি ছাত্র-ছাত্রীও ভর্তি হচ্ছেনা ঐ কলেজে।

দেশের জেলা শহর, উপজেলা বা গ্রামাঞ্চল গুলোতে এটি একটি সাধারণ চিত্র। অনেক সময় বেকার যুবক-যুবতীরা স্থানীয় সরকার দলীয় এমপি সাহেবদের সহায়তায় নিজেরাই স্কুল-কলেজ বানিয়ে ফেলে। কারণ যদি এমন কোন প্রতিষ্ঠান তৈরী করে কোনমতে এমপিওভুক্ত করা যায়, তবে চাকুরী, রাজনীতি এবং ব্যবসা সবই একসাথে হতে পারে। এজন্য অনেকে সরকারী দলের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী বা নেতা কিংবা মরহুম নেতা (যেমন জিয়াউর রহমান) বা মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীদের নামও ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু এইসব প্রতিষ্ঠান কার্যত শিক্ষার প্রসারে কোন ভূমিকাতো রাখছেই না বরং শিক্ষাকে পাতালে নামাচ্ছে।

এমনিতেই সাধারণভাবে আমাদের দেশের শিক্ষার মান ভয়ংকরভাবে নীচু। এদের ভাষা জ্ঞান, সাধারণ জ্ঞান বা অঙ্ক, ইংরেজী, ইতিহাস ভূগোল; সব জ্ঞানই এতো দুর্বল যে, বেশীর ভাগ সার্টিফিকেট প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী নিজের একটি জীবনবৃত্তান্ত সঠিকভাবে প্রস্তুত করতে পারেনা। এবারের এইচএসসি ফলাফল আবারো আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো যে, রাজনৈতিক বক্তৃতা বা দলীয়করণ করে গ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে শিক্ষাদানের জন্য উন্নত করা যাবেনা। বছরে আমরা যে ১৪ হাজার কোটি টাকা শিক্ষাখাতে বিনিয়োগ বা ব্যয় করছি তার সুফল যে কেবল মুষ্টিমেয় কিছু লোক পাচ্ছে এবং সেই মুষ্টিমেয়রাও যে কেবল শহরেই বাস করে, সেটি আমাদেরকে খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে।

দ্বিতীয়ত এবারের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর এই আশঙ্কা আরো দৃঢ়ভাবে দেখা দিলো যে, প্রায় ৬০ হাজার শিক্ষার্থী, যাদের প্রায় সকলেই মফস্বলের, তাদের উচ্চশিক্ষার দ্বার বন্ধ হয়ে গেছে। দেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য যেসব সরকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে তা সম্ভবত জিপিএ পাচ পাওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারাই পূর্ণ হয়ে যাবে। এমন হতে পারে যে, সকল জিপিএ পাঁচ পাওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের এবার জায়গাও হবেনা। জিপিএ পাঁচ পাওয়া কিছু উদ্বৃত্তকে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দ্বারস্থও হতে হবে। অন্যদিকে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গলাকাটা ব্যবসা এবং নিম্নমুখী শিক্ষার মানের জন্য সেখানে না পড়িয়ে ছেলেমেয়েদেরকে হালচাষ করতে দেয়া অনেক ভালো।

তৃতীয়ত দেশের শিক্ষিত বেকারের কর্মসংস্থানের ব্যাপারেও বিগত চার বছরে সরকার কোন কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি। যদিও কিছুদিন আগে সংসদে দেয়া বিবৃতিতে সরকার বলেছে, মাত্র তেরো লাখ শিক্ষিত বেকার নাকি দেশে রয়েছে,

কার্যত দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দুই কোটির উপরে। এই মিথ্যাচারের সহায়তায় খালেদা-নিজামী সরকার শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চায়।

আজকের বেকারত্ব আবার বর্তমান রূপেই থাকবেনা। কারণ এখন যারা বেকার, তারা চাকুরী না থাকার জন্য বেকার। কিন্তু আগামীতে চাকুরী থাকার পরেও সেইসব চাকুরী করার যোগ্যতা না থাকার জন্য তাদেরকে বেকার থাকতে হবে। কেননা ভবিষ্যতের চাকুরী করার উপযুক্ত শিক্ষা আমাদের দেশে এখন দেয়া হচ্ছেনা। আমরা কি বুঝি যে, আমাদের দেশের যে ছেলেটি এখন অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে, সে আসলে গাড়ীর কন্ট্রোল বোর্ডে যে পিসিবি ব্যবহৃত হচ্ছে তার খবরই রাখছেনা। কারণ তাকে এখনো ম্যাকানিক্যাল অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং শেখানো হচ্ছে। ২০০৫ সালের টয়োটা গাড়ীতে যে প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড থাকে সেটি তার সিলেবাসে নেই। হতে পারে যে, তাকে যারা শেখায় তারা ইচ্ছা করেই এমনসব নতুন বিষয় সিলেবাসে ঢোকায়না-কারণ তারাই সেইসব বিষয় পড়াতে জানেনা। ফলে এখন বাংলাদেশে ডিগ্রী নিয়ে প্রকৌশলের অনেক শাখাতেই সময়ের দাবী অনুযায়ী দক্ষতা দেখানো সম্ভব হচ্ছেনা। এমনকি কম্পিউটার বিজ্ঞানের মতো পরিবর্তনশীল বিষয় পড়ে ছাত্র-ছাত্রীরা এখন কোন প্রতিষ্ঠানে কাজ করার উপযুক্ততা অর্জন করতে পারেনা। ফলে কেরানী তৈরীর এই শিক্ষা অচিরেই মুখ থুবড়ে পড়তে বাধ্য।

আমরা মনে করি, কসমেটিক সার্জারী নয়, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার অভারঅল ওভারহলিং দরকার । আমাদেরকে মানতে হবে যে, জিপিএ পাচ আর পাশের হার বাড়ানো শিক্ষাব্যবস্থার অগ্রগতির লক্ষ্মণ নয়।

আসাম রাজ্য সরকারের একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত

কদিন আগে ভারতের ইটিভির (১৪ সেপ্টেম্বর ০৫ সন্ধ্যার) খবরে বলা হয়েছে- আসামের মুখ্যমন্ত্রী আসামে ২০০৫ সালে যারা স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ পেয়েছে তেমন ১৩ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর প্রত্যেককে একটি করে কম্পিউটার দিয়েছেন। আমি মনে করি, ভারতের একটি অঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্ত একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। এর ফলে শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষার মান বাড়াতে আরো অনেক বেশী উৎসাহিত হবে। আমাদের দেশে বিগত সরকার প্রধান শেখ হাসিনা স্কুল কলেজে দশ হাজার কম্পিউটার দেবার একটি প্রকল্প চালু করেন। তার সময়কালে আমলারা নানা অজুহাতে সেই কার্যক্রম সমাপ্ত করেনি। তখনকার শিক্ষামন্ত্রী এতো বেশী ব্যস্ত ছিলেন যে, এদিকে সম্ভবত নজরই দিতে পারেননি। পরে বর্তমান সরকার গত বছর সেই প্রকল্পটির কম্পিউটার প্রদানের কাজটি সমাপ্ত

করে। কিন্তু এবার সেই কার্যক্রম মুখ থুবড়ে পড়েছে। সাইফুর রহমান এবার স্কুল-কলেজে কম্পিউটার প্রদানের জন্য কোন বাজেট বরাদ্দই রাখেন নি।

কিন্তু আমরা কি এবার যারা এইচএসসি এবং এসএসসিতে জিপিএ পাঁচ পেয়েছে তাদেরকে আসাম সরকারের মতো একটি করে কম্পিউটার দিতে পারিনা। ঘটা করে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন বা চীন-বাংলা মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে সর্ম্বধনা অনুষ্ঠান আয়োজন করার নামে বেগম খালেদা জিয়ার হাত দিয়ে একটি সার্টিফিকেট তুলে দেবার ব্যবস্থা না করে আসাম সরকারকে অনুসরণ করা যেতে পারে।

আমি জানিনা, খালেদা-নিজামী সরকারের মাথায় এই প্রস্তাব প্রবেশ করবে কিনা।

২রা অক্টোবর ২০০৫॥ ০৬ ফেব্রুয়ারি ০৬ সম্পাদিত